ফোন: ০২৪৭৭৭০২৪১৮ (অফিস)
ই-মেইল: ad.duck.khulna@gmail.com
ওয়েব: www.rdbf.khulna.gov.bd

"স্মার্ট লাইভস্টক,
স্মার্ট বাংলাদেশ"

হাঁস পালন সহায়িকা

উপপরিচালকের কার্যালয়
আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার
দৌলতপুর, খুলনা।

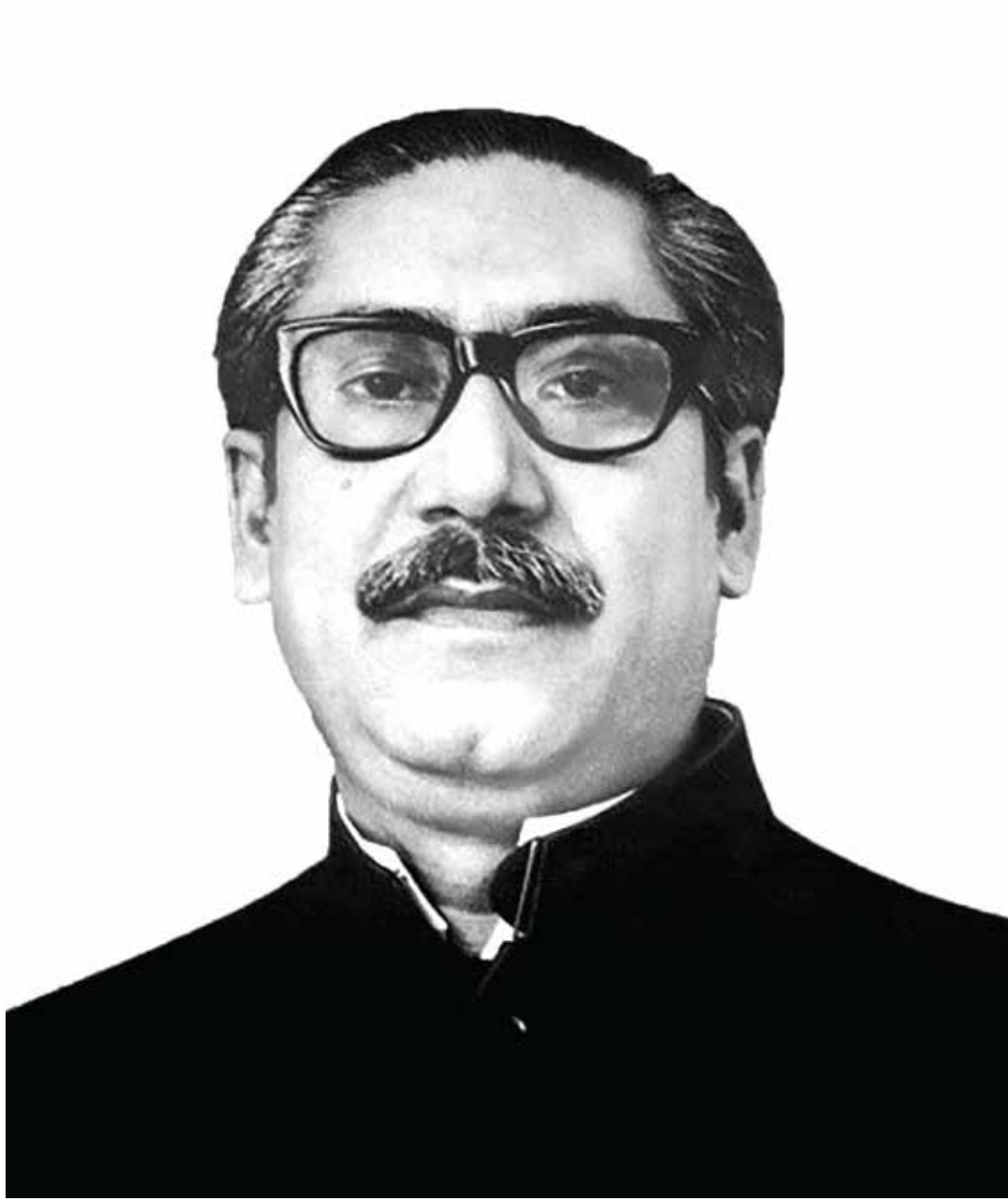

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

প্রধান পৃষ্ঠপোষক **মোঃ রফিকুল ইসলাম (বিসিএস প্রাণিসম্পদ)**
উপপরিচালক
আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার, দৌলতপুর, খুলনা।

সম্পাদক **শেখ আল মামুন (বিসিএস প্রাণিসম্পদ)**
সিনিয়র সহকারী পরিচালক
আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার, দৌলতপুর, খুলনা।

সদস্যবৃন্দ **সঞ্জীব কুমার বিশ্বাস**
উপসহকারী প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (পোল্ট্রি প্রোডাকশন)
আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার, দৌলতপুর, খুলনা।

এস. এম. নাজমুল আলম
স্টোর কিপার
আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার, দৌলতপুর, খুলনা।

মুদ্রণ **কাকন প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশনস্**
৪০, জাহান মঞ্জিল, বেণীবাবু রোড, খুলনা
০১৯৩২২৫৯২৬৫

হাঁস পালন সহায়িকা

হাঁস পালনের গুরুত্বঃ

বাংলাদেশের নদী-নালা, খালবিল, হাওড়, পুকুর, ডোবা ছাড়াও আবহাওয়া ও জলবায়ু হাঁস পালনের জন্য উপযোগী। গ্রামীণ পরিবেশে হাঁস প্রাকৃতিক খাদ্য খেয়ে থাকে। এই কারণে একজন খামারী হাঁসকে সামান্য পরিমান খাদ্য প্রদান করে সারা বছরই লাভজনকভাবে হাঁস পালন করতে পারে।

উন্নত জাতের হাঁসের জাত ও বৈশিষ্ট্যঃ

বাংলাদেশে হাঁস উৎপাদনকারী এলাকাগুলোতে পাওয়া যায় এমন কয়েকটি জাতের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য:

- **দেশী জাতঃ** একটি হাঁসী বছরে ৭০-৮০টি ডিম দেয় এবং উন্নত ব্যবস্থাপনায় আবদ্ধ অবস্থায় এগুলো (দেশী সাদা ও দেশী কালো) বছরে প্রায় ২০০-২০৫টি ডিম পাড়ে। প্রাপ্ত বয়স্ক হাঁসার ওজন ১.৭৫ - ২.৫০ কেজি এবং হাঁসীর ওজন ১.০-১.৫০ কেজি।
- **খাকি ক্যাম্পবেলঃ** একটি হাঁসী বছরে ২৫০-২৬০টি ডিম পাড়ে। প্রাপ্ত বয়স্ক হাঁসার ওজন ২-২.২৫ কেজি এবং হাঁসীর ওজন ১.২৫-১.৫০ কেজি।
- **জিনডিংঃ** একটি হাঁসি বছরে প্রায় ২৪০টি ডিম পাড়ে। প্রাপ্ত বয়স্ক হাঁসার ওজন ১.৭৫-২.০০ কেজি এবং হাঁসীর ওজন ১.২৫-১.৫০ কেজি।
- **ইন্ডিয়ান রানারঃ** একটি হাঁসী বছরে প্রায় ২৫০-৩০০টি ডিম পাড়ে। প্রাপ্ত বয়স্ক হাঁসার ওজন ২.২৫-২.৫০ কেজি এবং হাঁসীর ওজন ১.২৫-১.৫০ কেজি।
- **পিকিংঃ** গায়ের রং সাদা, গড়ে ১৫০-১৬০টি ডিম দেয়, ওজন ৩.০০-৩.৫০ কেজি হয়ে থাকে।
- **মাসকোভিঃ** মাংসের জন্য ব্যবহার করা হয়, ডিম উৎপাদন ৮০-১০০টি, ওজন ৬-৭ কেজি হয়।

হাঁসের বাচ্চা প্রাপ্তির স্থানঃ

- সরকারী পর্যায়ে কেন্দ্রীয় হাঁস প্রজনন খামার নারায়নগঞ্জ ও আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার খুলনা, নওগাঁ, ফেনী, গোপালগঞ্জ, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, বাগেরহাট,

পটুয়াখালি, বরিশাল, মাদারিপুর, কুড়িগ্রাম, রাঙামাটি, ভোলা, সিরাজগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সুনামগঞ্জ, নীলফামারি, মাগুড়া ও হবিগঞ্জ হাঁস খামার থেকেও হাঁসের বাচ্চা পাওয়া যায়।

- অনেকে ব্যক্তি পর্যায়ে হাঁসের বাচ্চা উৎপাদন করে বিক্রি করে থাকেন।

হাঁস পালন পদ্ধতি:

হাঁস বিভিন্ন পদ্ধতিতে পালন করা যেতে পারে, যেমন:

- আবদ্ধ পদ্ধতি:

এই পদ্ধতিতে হাঁসকে ঘরের মধ্যে রেখে লালন পালন করা হয়। এই পদ্ধতিতে রাতে হাঁস ঘরে আবদ্ধ থাকে এবং দিনের বেলায় ঘরের সামনে চারণ এ ঘুরে বেড়ায়। এই পদ্ধতিতে দুইভাবে ঘর তৈরি করা যেতে পারে: মেঝেতে লালন পালন এবং তারের জালের ফ্লোর।

- ফ্লোরে লালন পালন: এই পদ্ধতিতে মেঝেতে লিটার (তুষ) এর উপর হাঁস পালন করা হয়।
- তারের জালের ফ্লোর: এই পদ্ধতিতে ফ্লোর থেকে উঁচু করে তারের জাল দিয়ে মাচা প্রস্তুত করে হাঁস পালন করা হয়। ফলে ফ্লোরের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ জায়গা কম লাগে।
- খাদ্য ঘরের ভিতরে অথবা চারণে দেয়া যেতে পারে। তবে সুবিধাজনক ভাবে চারণে দেয়া ভাল।
- ঘরের সাথে একটি পানির চৌবাচ্চা দেয়া যেতে পারে যার প্রস্থ ৩০ ইঞ্চি এবং গভীরতা ৬-৮ ইঞ্চি হয় যাতে হাঁসগুলো সহজে পানি খেতে এবং ভাসতে পারে।

- মুক্ত রেঞ্জ পদ্ধতি:

- এই পদ্ধতিতে হাঁসকে কেবলমাত্র রাতের বেলায় ঘরে আটকিয়ে রাখা হয় এবং দিনের বেলায় হাঁস বিভিন্ন জায়গায় যেমন-নদী নালা, খালবিল, হাওড়, পুকুর, ডোবায় বেড়িয়ে খায়।
- পূর্ণ বয়স্ক হাঁসের জন্য ৩ বর্গফুট জায়গা দরকার এবং বাড়ন্ত হাঁসের জন্য ২ বর্গফুট জায়গা দরকার।

- হার্ডিং পদ্ধতি:

এই পদ্ধতিতে হাঁসগুলোকে কোন প্রকার ঘরে রাখা হয়না। যে সমস্ত জায়গায় খাবার আছে সেই সকল এলাকায় হাঁসগুলোকে নিয়ে যাওয়া হয়। সারাদিন খাদ্যগ্রহণ করে রাতের বেলা হাঁসগুলোকে কোন একটি উঁচু জায়গায় আটকিয়ে রাখা হয়। এভাবে হাঁসগুলোকে একটি নির্দিষ্ট জায়গার কিছুদিন খাওয়ানোর পর অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়।

- ল্যানটিং পদ্ধতি:

এই পদ্ধতিতে বড় বড় বিল, হাওড়, জলাশয় এবং আশে পাশে ঘর তৈরী করে হাঁস পালন করা হয়, যাতে হাঁসগুলো রাতের বেলায় থাকে। প্রতিটি ফ্লকে ১০০-২০০টি হাঁস থাকে।

হাঁসের বাসস্থান ও ঘরের ব্যবস্থাপনা:

হাঁস খুব বেশী গরম ও খুব বেশী ঠান্ডা সহ্য করতে পারে না। হাঁসের ঘর নির্মাণ করতে গিয়ে বেশী খরচ না করে সীমিত খরচের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিৎ। আবার বাসস্থান নির্মাণ করতে গিয়ে এমন নড়বরে ঘর রাখা উচিৎ নয় যাতে শিয়াল, বন বিড়াল, নেউল, চিকা, ইদুর ইত্যাদি হাঁস ও হাঁসের বাচ্চার ঘরে প্রবেশ করে ক্ষতি করতে পারে।

স্থান নির্বাচন:

- খোলামেলা উঁচু ও রৌদ্র থাকে এমন জায়গা নির্বাচন করা উচিত
- ড্রেন কাটার সুবিধা আছে এবং ঘাস জন্মাতে পারে এমন স্থান নির্ধারণ করা উচিত
- ঘরের আশে পাশে গাছ বা জঙ্গল থাকা এবং মুরগীর খামারের পাশে থাকা ঠিক নয়
- হাঁসের সংখ্যা এবং কি ধরণের ঘরে হাঁস পালন করা হবে তা বিবেচনা করে ঘর তৈরী করতে হবে।

ঘরের নমুনা:

- অল্প হাঁসের জন্য ছোট ঘর এবং বেশী হাঁসের জন্য বড় স্থায়ী ঘর তৈরী করাই ভাল।

- লম্বা, সরু এবং চারকোণা ঘর তৈরী করা উচিত।
- গ্রামীন পরিবেশ এবং প্রাকৃতিক দুযোর্গ ও পারিপাশিক অবস্থার বিষয় চিন্তা ভাবনা করে ঘরের চালা নির্বাচন করতে হবে।

মেঝে এবং মেঝের পরিমাপঃ

- মেঝে অবশ্যই স্যাঁতসেঁতে মুক্ত হবে এবং কোন প্রকার গর্ত থাকবে না।
- ১-২ সপ্তাহ বয়সের বাচ্চার জন্য ১ বর্গফুট, ৩-৪ সপ্তাহ বয়সের বাচ্চার জন্য ২ বর্গফুট এবং ৫-৭ সপ্তাহ ও এর উপরের বয়সের হাঁসের জন্য ৩ বর্গফুট জায়গার দরকার।

খাবার ও পানির পাত্রঃ

- ঘরে পানির জন্য ওয়াটার চ্যানেল তৈরী করতে হবে যার প্রস্থ ৩০ ইঞ্চি এবং গভীরতা ৮-৯ ইঞ্চি।

হাঁসের বাসস্থানে করণীয় -

তাপমাত্রা:

- হাঁসের জন্য খুব বেশী বা কম তাপ ক্ষতিকর
- ঘরের তাপমাত্রা ৫৫ ডিগ্রী ফাঃ ৭৫ ডিগ্রী ফাঃ পর্যন্ত রাখাই সর্বোত্তম।

আদ্রতা:

- হাঁসের ঘরের আদ্রতা ৭০% থাকাই বাঞ্চনীয়,
- অনুকূল পরিবেশ এবং আবহাওয়ায় লোম গজানো, শারীরিক বৃদ্ধি এবং ডিম উৎপাদন ভাল হয়। ঘরের আদ্রতা ৭০% এর বেশী হলে ককসিডিয়া ও কৃমি হয়।

আলোঃ

- হাঁসের ঘরে প্রথম ৬ সপ্তাহ পর্যন্ত রাতে আলোর ব্যবস্থা রাখলে হাঁসের বাচ্চা খাদ্য বেশী খাবে এবং দৈহিক ওজন বৃদ্ধি পাবে,
- ডিম পাড়া হাঁসের জন্য ১৪-১৬ ঘন্টা আলো থাকা দরকার। এই অতিরিক্ত আলোর জন্য বাল্বের মাধ্যমে কৃত্রিম আলোর ব্যবস্থা করতে হবে।

বাতাস চলাচল ব্যবস্থা (ভেন্টিলেশন):

- হাঁসের ঘর শুষ্ক রাখার জন্য বাতাস চলাচল ব্যবস্থা খুবই জরুরী।
- ঘরের দেয়ালের শতকরা ৪০ ভাগ লম্বালম্বি তারের জালের বা বাঁশের সাহায্যে ছিদ্রওয়ালা বেড়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

হাঁসের বাচ্চার ব্রুডিং ব্যবস্থাপনাঃ

- ব্রুডিং হচ্ছে বাচ্চাকে তাপ দেওয়া। ব্রুডার হচ্ছে যেখানে বাচ্চাকে রেখে তাপ দেওয়া হয়।
- ব্রুডিংকালে হাঁসের বাচ্চার মৃত্যুহার খুব বেশী হয়ে থাকে। তাই এ সময় বাচ্চার যত্নে প্রয়োজনীয় কৃত্রিম তাপ, আলো ও বায়ু চলাচল এর সুব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
- বাচ্চা ব্রুডিং ঘরে নেয়ার ১২-১৪ ঘন্টা পূর্ব থেকেই ঘর গরম (২৮ ৩১ সেঃ) করে রাখতে হয়। তা না হলে প্রথম কয়েকদিনের ঠান্ডা এবং কম তাপমাত্রার কারণে বাচ্চাগুলো নিউমোনিয়া, ডায়রিয়া ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হবে এবং নাভী শুকাতে দেরী হবে। অন্যদিকে তাপমাত্রার ব্যবস্থা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হলে বাচ্চার মৃত্যুর হার নেমে আসবে।
- শীতকালে সাধারণতঃ ৩-৪ সপ্তাহ এবং গরম কালে ২-৩ সপ্তাহ ব্রুডিং করতে হবে। ইলেকট্রিক বাল্ব, গ্যাস চুলা, কেরোসিনের চুলা ও বি,এল, আর, আই উদ্ভাবিত ব্রুডার দিয়ে ব্রুডিং করা যায়।
- চিক গার্ড হচ্ছে বাচ্চাকে তাপ দেওয়ার জন্য ব্রুডার বক্সের চারিদিকে ঘেরাও করে দেয়া, যাতে বাচ্চা নির্দিষ্ট বেষ্টনীর বাইরে না যেতে পারে। চিক গার্ডের ভিতরে বাচ্চা ছাড়ার আগেই পানির পাত্র সরবরাহ করতে হবে।

হাঁসের বাচ্চা ব্রুডিংকালে প্রয়োজনীয় কৃত্রিম তাপ, আলো ও বায়ু চলাচল ব্যবস্থাঃ

বয়স (সপ্তাহ)	তাপমাত্রা (ফা)	আলো প্রদান (ঘন্টা/দিন)	বায়ু চলাচল
২	৯০	১৮	ঘরে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা থাকলে ক্ষতিকর গ্যাস বেরিয়ে যাবে। আর্দ্রতা ঠিক থাকবে ও বাচ্চা সুস্থ্য থাকবে।
৩	৮৫	১৪	
৪	৮০	১২	
৫	৭৫	১২	
৬	৭০	১২	

হাঁসের বাচ্চা পানিতে ছাড়ার সময়ঃ

সাধারণতঃ চার সপ্তাহ পর্যন্ত হাঁসের বাচ্চা পানিতে ছাড়া উচিৎ নয়। ৪ সপ্তাহ পর্যন্ত ঘরে প্রতিপালন করে তারপর পানিতে ছাড়ার অভ্যাস করতে হবে। পানিতে ছাড়ার সময় হলে **১ম** দিনই সারা দিন পানিতে রাখা ঠিক নয়, ধীরে ধীরে পানিতে চরার অভ্যাস করতে হবে। গরমকালে দু'সপ্তাহ পরেই পানিতে ছাড়া যেতে পারে।

হাঁসের খাদ্য ব্যবস্থাপনাঃ

- আবদ্ধ অবস্থায় একটি পূর্ণ বয়স্ক হাঁস প্রতিদিন ১৬০ গ্রাম সুষম খাবার খায়।
- গ্রামাঞ্চলে হাঁস অর্থ আবদ্ধ পদ্ধতিতে পালন করা হয়। পুকুর খাল-বিল, নদী ইত্যাদিতে হাঁস চড়ে বেড়ায় এবং এখান থেকেই খাদ্য সংগ্রহ করে।
- অনেক খামারীগণ হাঁসকে শুধু ধানের কুঁড়া, চাল, গম এসব খেতে দেয়। এতে ডিমের উৎপাদন কমে যায়।

খাদ্য উপকরণে যে পুষ্টি উপাদান অধিক পরিমানে থাকে তাকে সে জাতীয় খাদ্য বলে। যেমন-

- শর্করা জাতীয় খাদ্য (ভুট্টা, গম, কাওন, চাউলের কুঁড়া, গমের ভুষি, ইত্যাদি)।
- আমিষ জাতীয় খাদ্য (সয়াবিন মিল, শামুক, ছোঁট মাছ, তিলখৈল, শুটকিমাছ, মিটমিল, ইত্যাদি)।
- চর্বি জাতীয় খাদ্য (এনিমেল ফ্যাট, হাঁস-মুরগরি তৈল, ভেজিটেবল অয়েল, সার্কলিভার ওয়েল, ইত্যাদি)।
- ভিটমিন জাতীয় খাদ্য (শাকসজি ও কৃত্রিম ভিটামিন)
- খনিজ জাতীয় খাদ্য (ঝিনুক, ক্যালশিয়াম ফসফেট, রকসল্ট, লবন, ইত্যাদি)।
- পানি: দেহ কোষে শতকরা ৬০-৭০ ভাগ পানি থাকে। তাই কোন প্রাণি খাদ্য না খেয়েও কিছু দিন বাঁচতে পারে, কিন্তু পানি ছাড়া সামান্য কিছু দিনের বেশী বাঁচে না।
  - সাধারণত দেহ থেকে পানির ক্ষয় হয় মলমূত্র ও শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে।
  - অপরদিকে পানি আহরিত হয় পানি পান করে, রসালো খাদ্য গ্রহণ করে এবং
  - দেহের ভিতর বিভিন্ন পুষ্টি উপদানের অক্সিডিশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।
  - দেহের বেশির ভাগ অংশ পানি দ্বারা গঠিত।

  - ডিমের বেশির ভাগ অংশ পানি দ্বারা গঠিত।
  - হাঁস-মুরগির দেহে পানির কাজ:
- খাদ্যতন্ত্রের মধ্যে খাদ্য বস্তু নরম ও পরিপাকে সাহায্য করে।
- খাদ্যতন্ত্রের মধ্যে পুষ্টি উপাদান তরল করে দেহের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পরিবহণ
- করে।
- দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণ করে ও দেহকে সতেজ রাখে।
- দেহের ভিত্তিতে দুষিত পদার্থ অপসারণ করে।
- দেহের গ্রন্থি হতে নিঃসৃত রস, হরমোন, এনজাইম এবং রক্ত গঠনে ভূমিকা
- রাখে।

শর্করা জাতীয় খাদ্য আবার ২ প্রকার

- দানাদার: সকল প্রকার দানাদার খাদ্যশস্য যেমন, ভুট্টা গম, যব, কাওন, চাউল ইত্যাদি।
- আঁশ: সকল প্রকার দানাদার খাদ্যের উপজাত যেমন: চাউলের কুঁড়া, গমের ভূষি, ষ্টার্চ গুটেন, কাসাভা ইত্যাদি।
- হাঁস-মুরগির খাদ্যের বেশির ভাগ শর্করা পুষ্টি উপাদান যেমন: দানাদার শতকরা ৪০ হতে ৬০ ভাগ এবং উপজাত অংশ শতকরা ১০ হতে ১৫ ভাগ ব্যবহার করা হয়।

আমিষ জাতীয় খাদ্য আবার ২ (দুই) প্রকারঃ

- প্রাণিজ আমিষ: যে সমস্ত আমিষের উৎস প্রাণী থেকে হয় তাকে প্রানীজ আমিষ বলে। যেমন: শুটকি মাছ, শুটকি মাংস মিট ও বোনমিল, ফিদার মিল, লিভার মিল, প্রোটিন কনসেনট্রেট ইত্যাদি।
- উদ্ভিদ আমিষ: যে সমস্ত আমিষের উৎস উদ্ভিদ থেকে হয় তাকে উদ্ভিদ জাতীয় আমিষ বলে। যেমন: সয়াবিন মিল, তিল খৈল, তৈল বীজের খৈল, তুলা বীজের খৈল, সবুজ শাক-সবজি ইত্যাদি।
- বয়সভিত্তিক হাঁসের সুষম খাদ্যে বিভিন্ন দানাদার খাদ্য উপাদান ও উক্ত উপাদানের মিশ্রনের পরিমান নিম্নরূপ:

বিভিন্ন বয়সের হাঁসের খাদ্য উপাদান ও মিশ্রণের পরিমানঃ

উপকরণের নাম	ডিমপাড়া হাঁসের জন্য পরিমাণ (কেজি)	বাড়ন্ত হাঁসের জন্য পরিমাণ (কেজি)	বাচ্চা হাঁসের জন্য পরিমাণ (কেজি)
ভুট্টা ভাংগা	৫৩ কেজি	৫৫ কেজি	৫০ কেজি
পালিশ	১০ কেজি	১৮ কেজি	২০ কেজি
সয়াবিন মিল	২০ কেজি	১৫ কেজি	২০ কেজি
প্রোটিন কনসেনট্রেট	৫.৫ কেজি	৫ কেজি	৬ কেজি
ডিসিপি প্লাস পাউডার	১ কেজি ৭৫০ গ্রাম	২ কেজি ২৫০ গ্রাম	৩ কেজি ২৫০ গ্রাম
লাইমষ্টোন	৯ কেজি	৪ কেজি	০০ কেজি
লবণ	৫০০ গ্রাম	৫০০ গ্রাম	৫০০ গ্রাম
ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	২৫০ গ্রাম	২৫০ গ্রাম	২৫০ গ্রাম
মোট পরিমাণ	**১০০ কেজি**	**১০০ কেজি**	**১০০ কেজি**

হাঁসের খাদ্য সরবরাহের পরিমানঃ

প্রথম দিন থেকে ৫ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত ক্রাম্বল খাবার যতটুকু খেতে পারে দিতে হবে, ৬ষ্ঠ সপ্তাহে ৮০ গ্রাম/বাচ্চা, ৭ম সপ্তাহে ৯০ গ্রাম, ৮ম সপ্তাহে ১০০ গ্রাম, ৯ম সপ্তাহে ১১০ গ্রাম এবং ১০ম সপ্তাহ থেকে ২০% ডিম পাড়া পর্যন্ত ১২০ গ্রাম করে খাবার দিতে হবে। এরপর চাহিদা অনুযায়ী খাবার বাড়াতে হবে। একটি পূর্ণ বয়স্ক ডিমপাড়া হাঁস দৈনিক ১৬০ গ্রাম করে সুষম খাবার দিতে হয়।

হাঁসের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনাঃ

হাঁসের দু'টি মারাত্মক রোগ হলো ডাক প্লেগ ও ডাক কলেরা রোগ। এ দু'টি রোগের লক্ষণ ও প্রতিকার সর্ম্পকে আলোচনা করা হল।

ডাক প্লেগঃ

হাঁসের ডাক প্লেগ জীবানু এক প্রকার ভাইরাস। এ রোগ অত্যন্ত ছোঁয়াচে। তাই খামারে এ রোগের প্রদুর্ভাব ঘটলে দ্রুত সকল হাঁসে ডাক প্লেগ রোগ ছগিয়ে পড়ে। তাই হাঁস চাষ করতে হলে সকল হাঁসকে অবশ্যই নিয়মিতভাবে এ রোগের টিকা দিতে হবে।

ডাক প্লেগ রোগে আক্রান্ত হাঁসের লক্ষনঃ

- আক্রান্ত হাঁস দাঁড়াতে পারে না, খুঁড়িয়ে হাঁটে এবং সাঁতার কাটতে চায়না।
- বয়স্ক হাঁস বেশী মারা যায়।
- রোগ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাঁসের পিপাসা বেড়ে যায়।
- হাঁস পাখা মাটিতে ঝুলিয়ে বসে থাকে।
- হলুদ রংএর পাতলা পায়খানা হয়।
- কখনও কখনও পায়খানার সাথে রং দেখা দেয়।
- নাক দিয়ে পানি ঝরে।

ফাউল কলেরা বা হাঁসের কলেরাঃ

হাঁসের কলেরা জীবানু এক প্রকার ব্যাকটেরিয়া। এই জীবানু হাঁসের দেহে প্রবেশ করে রক্তের সাথে মিশে এক প্রকার বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং রক্ত চলাচলের সাথে মিশে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। আক্রান্ত হাঁসের মল দ্বারা এ রোগ খাদ্য ও পানিকে দূষিত করে এবং খামারে ছড়িয়ে পড়ে। বাজার থেকে রোগাক্রান্ত হাঁস কিনে আনলেও এ রোগ খামারে ছড়াতে পারে। সকল বয়সের হাঁস এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

কলেরা রোগে আক্রান্ত হাঁসের লক্ষণঃ

- এ রোগে আক্রান্ত হাঁস খেতে চায়না।
- পালকগুলো খসখসে হয়ে যায়, চেহারায় অবসন্নতা আসে ও রক্তশূন্য মনে হয়ে।
- হাঁসের পিপাসা বেড়ে যায়।
- পায়খানার রং সবুজ এবং সাদা ও ফেনাযুক্ত মনে হয়।
- চলাফেরা করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।
- এক জায়গায় দাড়িয়ে ঝিমাতে থাকে এবং অল্প সময়ের মধ্যে মারা যায়।

হাঁসের উপরোক্ত দু'টি রোগ ছাড়াও হাঁসের খাদ্যে বিষক্রিয়াজনিত কারণ যেমন, আফলাটক্সিন ও বটুলিজম এর বিষক্রিয়ায় হাঁসের মুত্যু ঘটতে দেখা যায়। তাই এ বিষয়েও আলোচনা করা যেতে পারে। আফলাটক্সিন থেকে রক্ষা করার জন্য খাদ্য তৈরী করার সময় বিশেষ করে ভুট্টাদানা খুব ভালভাবে দেখে নিতে হবে যেন ভুট্টাদানার মুখে কাল দাগ অর্থাৎ ছত্রাক না থাকে। খাদ্য উপাদানে এ ধরণের

ভূট্টাদানা বাদ দিয়ে খাদ্য তৈরী করলে অন্ততঃ আফলাটক্সিন সমস্যা দূর করা যেতে পারে।

হাঁসের রোগ প্রতিকার

হাঁসের রোগ প্রতিরোধে প্রথমে আমাদেরকে রোগ বিস্তারের কারণ জানতে হবে। তা হলে হাঁসের রোগ প্রতিকার করা সহজ হবে।

রোগের বিস্তারের কারণসমূহঃ

- হাঁসের সুষম খাদ্যের অভাব।
- সীমাবদ্ধ স্থানে নির্ধারিত সংখ্যার চেয়ে অতিরিক্ত হাঁসের অবস্থান।
- অস্বাস্থ্যকর বাসস্থান বা পরিবেশে হাঁস পালন।
- খামারে রোগ সৃষ্টিকারী অনুজীবাণু, জীবাণু, পরজীবী, ছত্রাক ইত্যাদির আবির্ভাব।
- খামারীদের হাঁসের রোগজীবাণু বিষয়ে অসতর্কতা, অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতা।
- হাঁসকে দুষিত ও ভেজা খাদ্য সরবরাহ করা।

হাঁসের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় করণীয়ঃ

- প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় হাঁসের আচরণ পরীক্ষা করতে হবে।
- খাদ্য খাওয়া ও পানি পান করার পরিমানের উপর হাঁসের স্বাস্থের অবস্থা নির্ভর করে।
- ঘরে হাঁসের মৃত্যু হলে মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানসহ দ্রুত মৃত হাঁসের সৎকারের ব্যবস্থা করতে হবে।
- খাদ্যে বিষক্রিয়াজনিত রোগ যেমন আফলাটক্সিন ও বটুলিজম এর কারণে হাঁসের মৃত্যু ঘটতে দেখা যায়। এ বিষয়েও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যেতে পারে।
- খাদ্য থৈরীর সময় বিশেষ করে ভুট্টাবীজ খুব ভালোভাবে দেখে নিয়ে অন্যান্য খাদ্য উপাদানসহ খাদ্য তৈরী করলে এ সমস্যা এড়ানো সম্ভব।
- স্থানীয় ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরামর্শে খাদ্য বা পানির সাথে ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- খামারের জৈব নিরাপত্তা যথাযথভাবে পালন করতে হবে।

হাঁসের রোগ প্রতিরোধে করণীয়ঃ

- খামারে হাঁসের চিকিৎসার চেয়ে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা করা উত্তম।
- মনে রাখতে হবে অসুস্থ হাঁস একবার সংক্রামক রোগে অসুস্থ হলে চিকিৎসায় সেই হাঁস আর পূর্বের মত উৎপাদনশীল থাকে না।
- তাই হাঁসের রোগ প্রতিকার এর জন্য টিকা প্রদান কর্মসূচী হচ্ছে একমাত্র উত্তম উপায়।
- তবে হাঁসের ফাউল কলেরা রোগ প্রতিকারে স্বাস্থ্যকর বাসস্থান ও স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতন হলে এ রোগের জন্য টিকা প্রদানের প্রয়োজন হয় না। সাধারণত হাঁসকে কেবল ডাক প্ল্যাগ টিকা দিলে চলে।
- গবাদি প্রাণির চিকিৎসা সেবা গ্রহনের জন্য যথাসময়ে উপজেলা ভেটেরিনারি হাসপাতালে গিয়ে Veterinary Doctor এর পরামর্শ নেয়ার জন্য খামারীদের উদ্বুদ্ধকরণ।
- টীকাদান কর্মসূচী নিয়মিত অনুসরণ করলে সম্পূর্ণরূপে হাঁসের উক্ত রোগের ঝুঁকি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এসব রোগের টিকাদান পরিকল্পনা ও প্রদানের নিয়মাবলী নিম্নে প্রদান করা হলো:

হাঁসের রোগ প্রতিরোধক টীকাদান কর্মসূচীঃ

রোগের নাম	প্রয়োগের বয়স	প্রয়োগ পদ্ধতি
ডাক প্লেগ	প্রথম মাত্রা ২১-২৮ দিন বয়সে। দ্বিতীয় মাত্রা (বুস্টার ডোজ) প্রথম মাত্রার ১৫ দিন পর অর্থাৎ ৩৬-৪৩ দিন বয়সে পরবর্তী ৪-৫ মাস পর একবার।	বুকের মাংসে/ প্রয়োগ বিধিমতে
ডাক কলেরা	প্রথম মাত্রা ৪৫-৬০ দিন বয়সে। দ্বিতীয় মাত্রা (বুস্টার ডোজ) প্রথম মাত্রার ১৫ দিন পর অর্থাৎ পরবর্তী ৬০-৭০ দিন বয়সে পরবর্তী ৪-৫ মাস পর একবার।	ডানার তলদেশে পালক ও শিরাহীন স্থানে চামড়ার নীচে/ প্রয়োগ বিধিমতে।
এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা	একদিন বয়সে (হাই প্যাথোজেন) H_5N_1 টীকা দিতে হবে। এরপর ৩০, ৭০, ১১০, ২৩০, ৩৪০, ৪৬০ দিন বয়সে H_9N_2 (লো-প্যাথোজেন) টীকা দিতে হবে। এরপর ১৪০ ও ২৮০ দিন বয়সে H_5N_1 টীকা আবার দিতে হবে।	গলার চামড়ার নিচে/প্রয়োগ বিধিমতে

তুষ পদ্ধতিতে হাঁস-মুরগির বাচ্চা উৎপাদন

১. ভূমিকা, বাচ্চা ফুটানোর ডিমের উৎস্য, ডিম বাছাই, ডিম নির্বাচনঃ

প্রথম চীন দেশে এই পদ্ধতির প্রচলন হয়। বর্তমানে ভারত, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া সহ অনেক দেশে এই পদ্ধতিতে হাঁস-মুরগির ডিম থেকে বাচ্চা উৎপাদন করা হচ্ছে। দুঃস্থ ও বেকার মহিলাদের কর্মসংস্থানের জন্য এই পদ্ধতির প্রচলন করা যায়, একজন মহিলাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা যায়। এভাবে একজন মহিলা মাসে ১৫ হাজার থেকে ২০ হাজার টাক পর্যন্ত লাভ করতে পারে। ফুটানো ডিম নিজে উৎপাদন করে কিংবা কন্ট্রাক্ট উৎপাদনকারীর কাছ থেকে ডিম সংগ্রহ করা যাইতে পারে। সংগ্রহকৃত ডিম গুলি বাছাইকরে ভাল গুনগতমানের ডিমগুলো ফুটানোর জন্য নির্বাচন করতে হবে। নির্বাচনের জন্য মাঝারি আকারের, মাঝারি খোসাযুক্ত, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ভাংগা বা ফাটা নয় অল্প বয়সের ডিম নির্বাচন করতে হবে।

২. ডিম ফুটানো প্রয়োজনীয় বিষয়াবলী (হ্যাচিং ডোল তৈরীকরন, হ্যাচিং বেড তৈরীকরন পুটলি বাঁধন, ডোলে ডিম বসানো ইত্যাদি):

খুব সহজে এবং কম খরচে এই যন্ত্র তৈরি করা যায়। এই যন্ত্রের ২ টি অংশ থাকে। ডিম বসানোর অংশ এবং বাচ্চা ফুটানোর অংশ। ডিম বসানোর অংশ এই অংশকে ইংরাজিতে সেটার বলে। কাঠের বাতার সাথে হার্ডবোর্ড অথবা বাঁশের চাটাই দ্বারা ২ ফুটী ২ ফুট এবং ৩ ফুট খাড়া চার কোনা বাক্স তৈরি করতে হবে। বাক্সের উপর দিক খোলা থাকবে বাঁশের চাটাই দিয়ে ১৪ ইঞ্চি চওড়া (ব্যাস) ও ৩০ ইঞ্চি খাড়া গোল ডোল তৈরি করতে হবে। ডোলের উপড় ও নিচে খোলা থাকবে। বাক্সের ভেতর তলাতে ৬ ইঞ্চি পরিমান তুষ বিছতে হবে। বাক্সের ভিতরে তুষের উপর ডোল বসাতে হবে। ডোল ও বাক্সের মাঝে খালি জায়গা তুষ দিয়ে ভরতে হবে। ডোলের চারদিকে ও তলাতে ৬ ইঞ্চি তুষ থাকবে। বাক্সের মধ্যে দুই বা তার চেয়ে বেশি ডোল বসানোর জন্য বাক্সের আকার বড় করতে হবে।

২ ফুট প্রশস্ত, ৪ ফুট লম্বা ও ৩ ফুট খাড়া বাক্স ২ টি ডোলা বসানো যাবে।
৪ ফুট প্রশস্ত, ৪ ফুট লম্বা ও ৩ ফুট খাড়া বাক্সে ৪টি ডোল বসানো যাবে।
৪ ফুট প্রশস্ত, ৬ ফুট লম্বা ও ৩ ফুট খাড়া বাক্স ৬ টি ডোল বসানো যাবে।

প্রতিটি ডোলের মধ্যে ৪০০- ৫০০টি ডিম বসানো যাবে। ডোলে আকার বড় করলে সেই অনুপাতে বাক্সের আকার বড় করতে হবে।

চিত্র: ২৪ বাক্সের ভিতর ঢোল প্রস্তুতকরণ

বাচ্চা ফুটানোর অংশ এই অংশকে বাচ্চা ফুটানোর বিছানা এবং ইংরেজিতে হ্যাচার বেড বলে। ১৮ দিন ডোল থেকে ডিম বের করে বিছানার উপর বসাতে হয়। এখানে ডিম থেকে বাচআ ফুটে বে হয়। এক হাজার ডিম বসানোর জন্য ৪২ ইঞ্চি লম্বা ও ২৪ ইঞ্চি চওড়া বিছানা প্রয়োজন হয়। হার্ড বোড্রের চারদিকে কাঠের বাতা দিয়ে এই বিছানা তৈরি করা যায়।

- বাচ্চা পড়ে যাওয়া ঠেকানোর জন্যে বিছানার বারদিকে কাঠের তক্তা দিয়ে ৬ ইঞ্চি বেড়া তৈরি করতে হয়।
- বিছানার উপরে ২/৩ ইঞ্চি পুরু করে তুষ বিছাতে হয়।
- কাঠের বা বাঁশের খুটির সাহায্যে এই বিছানা বহুতলা করা যায়।

চিত্র: ২৫ বাচ্ছা ফুটানোর বিছানা

ডিম ফুটানো ঘরঃ

- কম খরচে বাঁশের চাটাই দিয়ে বেড়া ও টিনের চালা দিয়ে ঘর তৈরি করতে হয়। আলো বাতাস চলাচলের জন্য ঘরে ছোট জানালা থাকবে।
- ঘরের চাল খড়, টিন অথবা বাঁশের তরজা ও পলিথিন দিয়ে করা যায়।
- ঘরের মেঝেতে তুষ বিছিয়ে দিলে ঘর গরম থাকবে ও মেঝের উপরে অতিরিক্ত ভেজা ভাব দূর হবে।
- ৮ ফুট চরড়া ও ১২ ফুট লম্বা ঘরে ৪ ফুটী ৬ ফুট বাক্স ও ৪ ২ ইঞ্চি লম্বী ২৪ ইঞ্চি চওড়া বিছানা রাখা যাবে।

ডিম বসানো নিয়ম ও গরম করার পদ্ধতিঃ

- লাইলনের তৈরি রংগিন মশারীর কাপড় দিয়ে ১০০-১২৫ টি ডিমের এক একটি পোটলা তৈরি করতে হবে। মুরগির ডিম বেশি ভংগুর এজন্যে ৪০-৫০ টি ডিম দিয়ে ছোট পোটলা করা ভাল।
- পোটলার মধ্যে ডিম গুলো ঢিলা করে বাঁধতে হবে।
- ডিমের পোটলাগুলোর রোদে ৩/৪ ঘন্টা গরম করতে হবে।

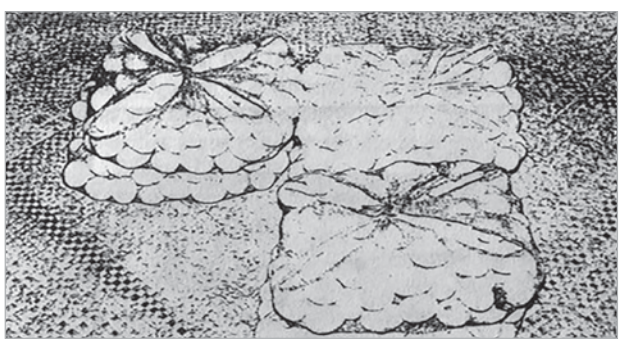

চিত্রঃ ডিমের পুটলি বাঁধার নিয়ম

- ডোলের আকারে গোল ২/৩ ইঞ্চি মোটা তুষ দিয়ে চটের পোঠলা তৈরি করতে হবে।
- প্রতিডোলে ৪০০-৫০০ ডিম বসানো যায়।

- পোটলাগুলো রোদে ১০৭৮ ডিগ্রী-১৮০ ডিগ্রী ফা: গরম করতে হবে।
- শীতের দিনে সকালে ওও বিকালে ২ বার এবং গরমের দিনে ১ বার তুষের পোটলা গরম করতে হয়।
- রোদ না থাকলে চলির উপরে লোহার কড়াই বসিয়ে তার মধ্যে তুষের পোটলা গরম করতে হয়।
- হিটার বা কেরসিনের চুলার উপরে বাঁশের ডোল দিয়েও উপরিভাগে বাঁশের চালনির উপর ডিম ও পোটলা গরম করা যায়।
- একই ডোলে বিভিন্ন সপ্তাহে বসানো ডিমের পোটলা থাকলে ডিমের ভেতরের তাপে পরে বসানো ডিম গরম হয়।

ডোলে ডিম বসানো পদ্ধতি

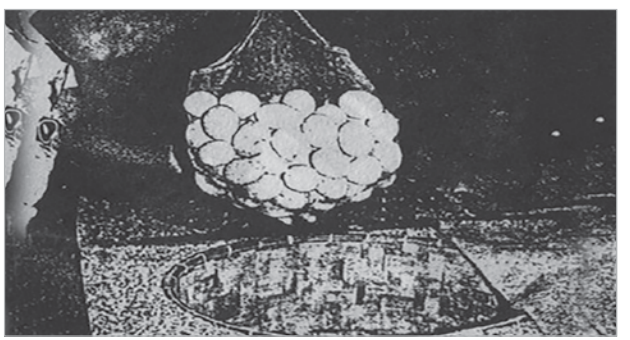

চিত্রঃ ডোলে ডিম বসানো পদ্ধতি

- ডোলের ভেতর প্রথমে গরম তুষের পোটলা তার উপড় ডিমের পোটলা তারপর পুনরায় তুতষের পোটলা এমনিভাবে ডিমের পোটলা ও তুষের পোটলা বসাতে হবে।
- প্রতিদিন পোটলা বেরকওে ২ বা ৩ বার ডিমের পার্শ্ব পরিবর্তন করতে হবে।
- ডিমের তাপ পরীক্ষার জন্য চোখের উপরে ধরলে তাপ অনুভব করা যাবে।
- ৭ দিন ১৪ দিন এবং ১৮ দিনে ডিমের মধ্যে ভ্রুণের অবস্থা আলোর সাহায্যে পরীক্ষা করতে হবে। অনূব্বর ডিম ও মৃত ভ্রুণযুক্ত ডিম বাছাই করে ফেলতে হবে।

বাচ্চা ফুটানোর বিছানায় ডিম বসানোর সময়ঃ

- ১৮ দিনে ডোলের মধ্য থেকে ডিম বের করে ডিম ফুটানোর বিছানায় ডিম বসাতে হবে।
- ঘরের তাপমাত্রা থাকবে ৮৫ডিগ্রী ফাঃ এবং হ্যাচারে বা বিছানায় ৯০-৯৫ ডিগ্রী ফাঃ। ঘরে ১০০ ওয়ার্টের ৩-৪ টা বাতি জ্বালানো হলে এই তাপ তৈরি হবে।
- তাপ ৯৫ ডিগ্রী ফাঃ এর বেশি হলে জানালা দরজা খুলে পাখার বাতাস দিতে হবে।
- আর্দ্রতা কমে গেলে সামান্য গরম পানি ডিমের উপর স্প্রে করতে হবে।
- ২১ দিনে মুরগির ডিম এবং ২৮ দিনে হাঁসের ডিম ফুটে বিছানার মধ্যে বাচ্চা বের হবে।
- বাচ্চা ফুটার ৩ দিন পূর্বে বিছানার উপরে রাখা ডিম আর ঘুরানো যাবে না।

৩. প্রথমদিন থেকে হ্যাচিংয়ের শেষ দিন পর্যন্ত দৈনন্দিন কার্যাদিঃ

দৈনন্দিন কার্যক্রম মধ্যে ডিম গুলি প্রতিদিন ৪-৫ ঘন্টা পর পর নাড়াচাড়া করা। ডিমের তাপমাত্রা যেন ১০০ডিগ্রী ফাঃ বজায় থাকে। সে লক্ষ্যে চুলায় গরম করা তুষ, বা ছাই দ্বারা ডিম গুলিকে গরম করতে হবে। উপরের পুটলি নীচে এবং নিচের পুটলি উপরে পালটে দিতে। আর্দ্রতা কম থাকলে অর্থাৎ ৭০% এর নিচে হলে দিনে যতবার ডিম ওলটপালট করা হবে ততবার কুসুম গরম পানিতে নরম কাপড় ভিজিয়ে ডিম মুছে দিতে হবে। এভাবে হ্যাচিং বিছানায় নেওয়া পর্যন্ত করতে হবে। হ্যাচিং বিছানায় নেওয়ার পর ডিম নাড়া চাড়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। হ্যাচিং বিছানায় তাপমাত্রা ৯৯ ডিগ্রী ফাঃ এবং আর্দ্রতা

৯০% রাখতে হবে। আর্দ্রতা ঠিক রাখার জন্য ডিমের উপর কুসুম গরম পানি প্রয়োজন বোধে স্প্রে করে দিতে হবে।

হাঁসের বাচ্চা পালন

ব্রুডিং ও ব্রুডিং কর্মসূচীঃ

অল্প বয়সে পালক না হওয়ায় বা ছোট থাকায় শরীর অবৃত্ত হয়না এ জন্য শরীরের তাপ নিয়ন্ত্রনের জন্য কৃত্রিম ভাগের প্রয়োজন হয়। এ অবস্থায় কৃত্রিম ভাবে তাপ দেওয়াকে ব্রুডিং বলা হয়। ব্রুডিং দুই ভাবে করা যায়। যথা: প্রাকৃতিক ব্রুডিং ও কৃত্রিম ব্রুডিং

- প্রাকৃতিক ব্রুডিং: মুরগির সাহায্যে প্রাকৃতিক ব্রুডিং করা হয়।
- কৃত্রিম ব্রুডিং: বৈদ্যুতিক, গ্যাস, কেরসিন ও অন্যান্য তাপের উৎসের মাধ্যমে ব্রুডিং করাকে কৃত্রিম ব্রুডিং বলে।

বাচ্চা ব্রুডিং ঘরঃ

খামারের বাচ্চা পালন করার জন্য তিন প্রকার ঘরের ব্যবহার করা হয়। যেমন:

- ব্রুডার হাউজ
- ব্রুডার-কাম-গ্রোয়ার হাউজ
- ব্রুডার-কাম-লেয়ার হাউজ

ব্রুডার হাউজঃ

- স্বতন্ত্র ব্রুডার ঘরের আকার ছোট হওয়াতে তাপ উৎপাদন খরচ কম।
- বাচ্চা ব্রুডিং শেষে বাচ্চাগুলোকে বিক্রি বা গ্রোয়ার হাউজে স্থানান্তর করা হয়।
- এই সময়ে বাচ্চা স্থানান্তর করলে বাচ্চার ধকল হয় ও রোগ বিস্তারের সম্ভবনা বারে।

ব্রুডরা ঘর কাম-গ্রোয়ার হাউজিঃ

- বর্তমানে এই ঘরের প্রচলন বেশী। ঘরের মধ্যে কিছু পরিমান স্থান পৃথক ভাবে ব্রুডিংয়ের ব্যবস্থা করা যায় এমন ভাবে তৈরীকরা হয়। পরে গ্রোয়িং অবস্থায়ও সেখানেই রাখা হয়।
- বাচ্চা বড় হওয়ার সাথে সাথে স্থানের প্রয়োজন বেশি হতে থাকলে পর্দা সরিয়ে বাচ্চা থাকার স্থান প্রসস্ত করা হয়।

- লেয়ার ঘরে স্থানান্তরের পূর্ব পর্যন্ত এ ঘরে বাড়ন্ত বাচ্চা পালন করা হয়।

ব্রুডার-কাম-লেয়ার হাউজঃ

- এই ঘরে বাচ্চা পালন ও বাড়ন্ত বাচ্চা পালন শেষে ডিম পাড়া পর্যন্ত হাঁস পালন করা হয়। প্রতি ব্যাচ বাচ্চা পালন করার জন্য বাচ্চার সংখ্যা নির্ধারন:
- খামারের প্রয়োজন ও ঘরের ধারন ক্ষমতানুসারে প্রতি ব্যাচে বাচ্চা পালন করার জন্য বাচ্চার সংখ্যা নির্ধারন করতে হয়।
- ৪ ফুট ব্যাসের হোভারের নীচে বাচচা ৪০০ টি ব্রুডিং করা হয়। এই হিসেবে ঘরে ব্রুডারের সংখ্যা নির্ধারন করা হয়।
- ঘরের আয়তন ও বাচ্চার সংখ্যানুসারে ঘরে ব্রুডার স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়।
- সকল সময় প্রয়োজনের অতিরিক্ত শতকরা ৫টি বাচ্চা বেশী পালন করা হয়।

ব্রুডারের তাপমাত্রাঃ

বাচ্চার বয়স	বাচ্চা			
সপ্তাহ	শীতকাল		গ্রীষ্মকাল	
	ফা:	সে:	ফা:	সে:
১-২	৯৫.০	৩৫.০	৯১.০	৩২.৭
২-৩	৯০.০	৩২.২	৮৬.০	৩০.০
৩-৪	৮৫.০	২৯.৪	৮১.০	২৭.২
৪-৫	৮০.০	২৬.৬	৭৫.০	২৩.৮

বাচ্চা ব্রুডিং ব্যবস্থাপনা

ব্রুডার চালু ও পাত্রের পানি প্রদান

- বাচ্চা গ্রহণের দিন ব্রুডারে পানির পাত্রে পানি দেওয়ার পর এবং বাচ্চা গ্রহণের ৩ ঘন্টা পূর্বে ব্রুডার চালু (তাপ উৎপাদন) করতে হয়। বেশী আগে চালু করলে লিটার বেশী শুকিয়ে যায় এবং পরে চালু করলে পানির তাপমাত্রা যথেষ্ট পরিমান হয় না পানির তাপমাত্রা ৬৫ ফাঃ (১৮সেঃ) হওয়া বাঞ্ছনীয়। (পানি প্রদান পদ্ধতি দ্রষ্টব্য)
- এই সময় প্রশস্ত খাদ্য পাত্র হিসাবে কাগজ/চিক বাক্সের ঢাকনি/পাষ্টিক ট্রে হোভারে নীচে স্থাপন করা হয়।

ব্রুডারে বাচ্চা প্রদানঃ

- খামারে বাচ্চা পৌছানোর সাথে সাথে পূর্ব থেকে প্রস্তুত পরিচার্যকারী বাচ্চার সরবরাহ গ্রহণ করবে এবং দ্রুত ব্রুডারে প্রদান করবে।
- সাধারনত সকালের দিকে ব্রুডারে বাচ্চা প্রদান করলে পরিচর্যা ও পর্যবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যায় এবং সকালে আবহাওয়া ঠান্ডা থাকার দরুন কম ধকল সৃষ্টি হয়।
- বাচ্চা গ্রহণের সময় চিক বাক্সের ভিতর মৃত বাচ্চা থাকলে তার সংখ্যা হিসাব করতে হয়।
- সম্ভব হলে বাচ্চার প্রাথমিক নমুনা ওজন রাখা যায়।
- বাচ্চা সরবরাহ তালিকার সাথে কোন অমিল থাকলে হিসাবে আনতে হয় এবং বাচ্চা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করতে হয়।

বাচ্চার আচরণ পরীক্ষাঃ

- ব্রুডারে বাচ্চা প্রদানের পর বাচ্চার আচরণ পরীক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- বাচ্চার জন্য অনুকূল তাপমাত্রা বাচ্চার আচরণ দেখে অনুমান করতে হয়, যেমন:
- ব্রুডারে তাপ বেশি হলে বাচ্চা তাপের উৎস হতে দূরে যায় এবং ব্রুডার গাড্রের গা ঘেষে জমা হয়।
- ব্রুডারে তাপ কম হলে তাপের উৎসের নীচে বেশী তাপের আশায় বাচ্চা ভীড় করে এবং পরস্পর জড়াজড়ি করে গরম হতে চেষ্টা করে। এই অবস্থায় চাপাচপিতে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে বাচ্চা মারা যায়।
- তাপ বাচ্চার অনুকূলে থাকলে বাচ্চা স্বতঃস্ফূর্ত থাকে এবং সুষ্ঠুভাবে খাদ্য খায় ও পানি পান করে।
- বাচ্চা স্বতঃস্ফূর্তভাবে চলাচল ও পানি পান না করলে বুঝতে হয় পরিবহন জনিত ধকলে পীড়িত অথবা অসুস্থ।
- হোভার অথবা তাপের উৎস উঁচু-নীচু কওে তাপ কম-বেশী করা হয়।
- ব্রুডারে বাচ্চা দেওয়ার পর রুটিন মত পর্যবেক্ষণ যথেষ্ট নয়। বার বার ব্রুডার ঘরে প্রবেশ করে আচরণ পরীক্ষার পর ব্যবস্থা নিতে হয়। ২ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত বাচ্চার অত্যন্ত সংকটময় সময়।

ব্রুডিং পূর্ব প্রস্তুতি, বাচ্চা ব্রুডিং ব্যবস্থাপনা

ব্রুডার ঘর প্রস্তুত

- ব্রুডার ঘর/ব্রুডার-কাম গ্রোয়ার ঘর খালি হওয়ার সাথে সাথে ঘরের সমস্ত সরঞ্জাম, লিটার /ব্রুডিং খাঁচা ইত্যাদি বের করতে হয়।
- ঘরের কোন সংস্কার প্রয়োজন হলে ব্যবস্থা নিতে হয়।
- ঘরের মেঝেতে লেগে থাকা ময়লা পানি দিয়ে ভিজিয়ে তুলে ফেলতে হয়।
- পরিস্কার পানি দ্বারা সমস্ত ঘর ধুয়ে ফেলতে হয়।
- ভেন্টিলেশন, ফ্যান, লাইট, দরজা জানালা ঝেড়ে মুছে পরিস্কার করতে হয়।

ঘর জীবানু মুক্ত করনঃ

- জীবানুণাশক ব্যবহৃত পানিতে ব্রাশ ভিজিয়ে ভেন্টিলেশন, ফ্যান, লাইট, দরজা জানালা ঝেড়ে মুছে পরিস্কার করতে হয়।
- ঘরের মেঝেতে আইয়োসান/ফিনাইল/স্যাভলন/ডেটল ইত্যাদি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হয়। অথবা অল্প খরচের জন্য ভিজা ঘরে মেঝের উপর প্রতি ১০০ বর্গ ফুট স্থানে এক কেজি কাপড় কাচা সোডা ভালভাবে ছড়িয়ে ১৫ মিনিট পরে ভালভাবে ধুয়ে ফেলতে হয়।
- ঘর পরিস্কার করার সময় ও জীবানুনাশক ব্যবহারের সময় পায়ে গাম্বুট, দেহে এফরোন ও মুখে মুখোশ ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়।

ঘরে লিটার/খাঁচা ও সরঞ্জামাদি স্থাপন

- ঘর জীবানুমুক্ত হওয়ার পর ভালভাবে শুকাতে হবে (১০-১৫ দিন)।
- শুকনা মেঝের উপর ২" পুরোকরে লিটার সামগ্রী বিছানোর পর ব্রডার গার্ড, হোভার, হিটার ইত্যাদি পর্যায়ক্রমে স্থাপন করতে হয়।
- ব্রুডার গাড্রের একফুট ভিতরে ড্রিংকার ও খাদ্যের পাত্র স্থাপনের জন্য স্থান রাখতে হয়।
- খাঁচায় ব্রডিং করলে লিটারের পরিবর্তে ব্রুডার খাঁচা স্থাপন করা হয়।
- ব্রুডার-কাম-গ্রোয়ার হাউজের উন্মুক্ত স্থান পর্দা দ্বারা ঢেকে দিতে হয়। গরমকালে চটের পর্দা এবং শীত ও বর্ষার সময় পাষ্টিক পর্দা ব্যবহার করা হয়।

- ব্রুডারক-কাম গ্রোয়ার হাউজে বাচ্চা ব্রুডিংয়ের জন্য নিদিষ্ট স্থান পাষ্টিক পর্দা দ্বারা ঘিরে পৃথক করতে হয় এবং ঘেরা স্থানে ব্রুডার স্থাপন করতে হয়।

ব্রুডার ও ঘরের তাপ মাত্রাঃ

ঘরের তাপ মাত্রাঃ

ঘরে বাচ্চা প্রদানের সময় ঘরের তাপ মাত্রা ৭৫ ডিগ্রী ফাঃ থাকে এবং ব্রুডিং শেষে ৬৫-৭৫ ডিগ্রী ফাঃ তাপমাত্রা রাখা হয়।

- হঠাৎ করে আলো নিভে যাওয়া, ঘরের তাপমাত্রা পরিবর্তন, ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা, খাদ্য ও পানির পরিবর্তন, বিভিন্ন প্রকার শব্দ ও হট্টগোল বাচ্চার ধকল সৃষ্টি করে। বাচ্চার আচরণ দেখে এ সমস্ত ধকল প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- ব্রুডারে বাচ্চা দেওয়ার পর তারা পানি পান করে।
- ব্রুডারে বাচ্চার পানি পান করার প্রবণতা পরীক্ষা করা হয়। প্রত্যেক বাচ্চা যাতে সহজে পানি পান করতে পারে সে ব্যবস্থা নিতে হয়। প্রয়োজন হলে হাতে ধরে পানি পান করাতে হয়।

খাদ্য প্রদান

- ব্রুডারে বাচ্চা দেওয়ার ২-৩ ঘন্টা পর প্রত্যেক বাচ্চার সঠিক পানি পান নিশ্চিত হয়ে প্রাথমিক পাত্রে ষ্টার্টার রেশন প্রদানের পূর্বে গম, ভুট্টা চূর্ন অথবা চাউলের খুঁদ দেওয়া যায়।

পানিতে বাচ্চা ছাড়বার সময়ঃ

সাধারণত: চার সপ্তাহ পর্যন্ত হাঁসের বাচ্চা পানিতে ছাড়া উচিৎ নয়। ৪ সপ্তাহ পর্যন্ত ঘরে প্রতিপালন করে তারপর পানিতে ছাড়বার অভ্যাস করতে হবে। পানিতে ছাড়বার সময় হলে ১ ম দিনই সারা দিন পানিতে রাখা ঠিক নয়, ধীরে ধীরে পানিতে চরার অভ্যাস করতে হবে। গরমকালে দুসপ্তাহ পরেই পানিতে ছাড়া যেতে পারে।

সরকারী খামার হতে হাঁসের বাচ্চা প্রাপ্তির স্থান ও মোবাইল নম্বর

ক্রমিক	প্রাপ্তির স্থান	মোবাইল নম্বর
১	কেন্দ্রীয় হাঁস প্রজনন খামার, নারায়নগঞ্জ	০১৩২৪২৯০৪১৬
২	আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার, দৌলতপুর, খুলনা	০১৩২৪২৮৯৮৭১
৩	আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার, সোনাগাজী, ফেনী	০১৩২৪২৯০৮৯৪
৪	আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার, নওগাঁ	০১৩২৪২৮৯৪১৪
৫	হ্যাচারীসহ আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার, কিশোরগঞ্জ	০১৩২৪২৯০২৮৬
৬	হ্যাচারীসহ আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার, ময়মনসিংহ	০১৩২৪২৯০১৮৯
৭	হ্যাচারীসহ আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার, নেত্রকোনা	০১৩২৪২৯০২৮৭
৮	হ্যাচারীসহ আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার, হবিগঞ্জ	০১৩২৪২৯০৭২৯
৯	হ্যাচারীসহ আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার, সুনামগঞ্জ	০১৩২৪২৯০৬১২
১০	হ্যাচারীসহ আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার, সিরাজগঞ্জ	০১৩২৪২৮৯৫১৪
১১	হ্যাচারীসহ আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার, নীলফামারী	০১৩২৪২৮৯১৫৫
১২	হ্যাচারীসহ আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন প্রজনন খামার, বাগেরহাট	০১৩২৪২৮৯৮৩৮
১৩	হ্যাচারীসহ আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার, মাগুড়া	০১৩২৪২৮৯৭৯১
১৪	হ্যাচারীসহ আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার, বরিশাল	০১৩২৪২৯০০৩৫
১৫	হ্যাচারীসহ আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার, ভোলা	০১৩২৪২৮৯৯৮৪
১৬	হ্যাচারীসহ আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার, ঝালকাঠি	০১৩২৪২৯০০৫০
১৭	হ্যাচারীসহ আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার, কুড়িগ্রাম	০১৩২৪২৮৯২৩৪
১৮	হ্যাচারীসহ আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার, পটুয়াখালি	০১৩২৪২৮৯৯৬২
১৯	হ্যাচারীসহ আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার, মাদারিপুর	০১৩২৪২৯০৫৬২
২০	হ্যাচারীসহ আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার, গোপালগঞ্জ	০১৩২৪২৯০৪৯৪
২১	হ্যাচারীসহ আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার, রাঙ্গামাটি	০১৩২৪২৯১০৮৫
২২	হ্যাচারীসহ আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	০১৩২৪২৯০৭৩৪